প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং নাগরিক নাট্যকলার সঙ্গে পার্থক্য বিচার

লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার আলোচনার অনেক পরে শুরু হয়েছে। অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্যানুসারে গুরুসদয় দত্তের 'বোলান' সম্পর্কিত আলোচনা The Folk Dances of Bengal (1954)-এ লোকনাট্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়[১]। কিন্তু গুরুসদয় দত্ত 'বোলান'কে Ballad Dance বলেছিলেন, লোকনাট্য বলেননি। কাজেই ঠিক লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা একে বলা যায় না। লোকনাট্য সম্পর্কে যতদূর জানা যায় — উল্লেখযোগ্য আলোচনা শুরু করেন অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। ১৯৭০ সালে 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে 'বাংলার লোকনাট্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। তার আগে বাংলার লোকশ্রুতিবিদেরা লোক সাহিত্যের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি গম্ভীরা বা লোকনাট্যের অন্যান্য রূপ নিয়ে ও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে লোকনাট্যের ধারায় সংগ্রহিত করে যে আলোচনা তার জন্য সময়ের অপেক্ষা ছিল। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। কিন্তু লোকনাট্য নিয়ে সেখানে কিছু আলোচনা ছিল না। বাংলা প্রবাদ, ছড়া, গান বা গীতিকা নিয়ে আলোচনার একটা সুবিধে এই যে এগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিসেবেই প্রচলিত। কিন্তু লোকনাট্য সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। লোকনাট্যকে অনেকে সঙ্গীতরূপে দেখেছেন, অনেকে নৃত্যরূপে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নৃত্য ও সঙ্গীত লোকনাট্যের দুটি আবশ্যিক উপাদান; তৃতীয় উপাদান সংলাপ। এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে লোকনাট্য। যাঁরা প্রথমদিকে সঙ্গীতরূপে একে দেখেছেন তাঁরা এর গীতাংশের উপর জোর দিয়েছেন, যাঁরা একে নৃত্যরূপে দেখেছেন তাঁরা তার নাট্যরূপ লক্ষ করেননি। হারাধন দত্ত ১৯৫৭ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে 'বোলান'কে নদীয়ার পল্লীগীতি[২] বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার তার কাহিনীগত গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তাকে গীতিকা বলেছিলেন। গীতিকায় গল্প বলা হয়। তাতে নাটকীয়তা যথেষ্ট থাকে, কিন্তু তা ঠিক লোকনাট্য নয়। অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর কথায় "গীতিকা যেমন নাট্যধর্মী, বোলানেও নাট্যধর্ম বিদ্যমান"[৩]। আসলে নাট্যধর্ম গীতিকায় আছে, বোলানেও আছে। কাজেই তা গীতিকারূপে পরিচায়িত হয়েছিল; তার বর্তমান পরিচয়ে নাট্যধর্মের উপরে জোর পড়েছে; তাই তাকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু হারাধন দত্ত নন, মণি বর্ধন[৪] তাঁর বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য' গ্রন্থে বোলানকে লৌকিক প্রেমসঙ্গীত রূপেই অভিহিত করেছেন।

'লোকনাট্য' ধারণাটি সম্ভবত তখন এতটা প্রচলিত হয়নি। লোকনাট্যে সঙ্গীতের ভূমিকা এবং পরিণামের গুরুত্ব বিবেচনা করে তখন লোকসঙ্গীত রূপেই তার মূল্যায়ন করা হত। ১৯৭০-এ 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা জোর পেয়েছে। লোকনাট্য সম্পর্কে এই যে ধারণা গড়ে উঠেছে তার মূলে হয়তো লোকসাহিত্যের এই অঙ্গটির নাটকীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও কিছুটা দায়ী। পূর্বে যে নাট্যধর্মের উপরে জোর পড়ত না এখন তাতে জোর পড়েছে। দ্বিতীয়ত নাটক সবসময়ই একটা মিশ্র শিল্প এবং যৌথ শিল্প। মিশ্র শিল্প বলেই তার মধ্যে থাকে নানা কলাবিদ্যার মিশ্রণ; তাতে সঙ্গীত, নৃত্য সংলাপ, বাদ্য, কাহিনী বর্ণনা সবই থাকে। তা যৌথ শিল্প কেননা — বহু শিল্পী, অভিনেতা বাদ্যকার এবং প্রযোজকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা যেমন গড়ে ওঠে তেমনি তার মঞ্চরূপায়ণ থাকে — আর থাকে দর্শকদের ভূমিকা। কাজেই অভিনেতা প্রযোজক মঞ্চরূপায়ণের রূপকার আর দর্শক — সকলের সম্মিলিত ভূমিকা থাকে বলেই তা যৌথ শিল্প। লোকনৃত্য বা সঙ্গীতের এই মিশ্রচরিত্র যেখানে প্রকাশিত হয় সেখানেই লোকনাট্যের সম্ভাবনা দেখা যায়। বর্তমানে গবেষকগণ এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তারিত করে চলেছেন বলেই লোকনাট্যের সীমানায় নূতন নূতন বিষয় স্থান পাচ্ছে। ১৯৭০ সালের পরে অনেকেই লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' নামক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ১৯৭২ সালে। লোকনাট্য নিয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখেছেন মানিক সরকার। ১৯৭০-এর পর থেকে আরও অনেকে এবিষয়ে আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক তরুণ গবেষকও একাজে অগ্রণী হয়েছেন।

লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনার একটি দিক তার উদ্ভবের ইতিহাস গড়ে তোলা। একাজে প্রমাণ অল্প; সেই স্বল্প প্রমাণকে অবলম্বন করে যাঁরা তার উৎস সম্পর্কে সন্ধান করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা অনেকেই আদিম সমাজের আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় উৎসবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে তারা সেই প্রাচীন লোকসমাজের যাদু-প্রক্রিয়ার প্রভাবের কথা বলেছেন। অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী লিখেছেন লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে যে যাদু অনুষ্ঠানের ভূমিকা সক্রিয় তা এক স্বীকৃত সত্য[১]। আবার পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন "নাচ গান চিত্রকলা প্রভৃতির আড়ালে শুরুতে যেমন জাদুর সংস্কার এবং তারপর ধর্মীয় প্রতীতির অস্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে দেখা গেছে, ঠিক তেমনিভাবেই নাটকের উদ্ভবের প্রেক্ষিতেও ঐ ব্যাপার দুটি লুকিয়ে ছিল ক্রমান্বয়ে[২]। তিনি কেবল লোকনাট্য নয় লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মূলেও জাদুবিশ্বাসের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। মানস মজুমদার জাদু অনুষ্ঠান থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর কথায় — "লোকনাট্যের ধারাটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর উৎস সুদূর অতীতে নিহিত। যাদু অনুষ্ঠান, উৎসব অনুষ্ঠান ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি হল লোকনাট্যের সম্ভাব্য

উৎস।"[৬]

তিনি যাদু অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেছেন — "বাংলার স্ত্রী সমাজে প্রচলিত বসুধারা এমনই এক যাদুমূলক ব্রতানুষ্ঠান। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে খালবিল পুকুর নদী যখন শুকিয়ে যায়, তখন বৃষ্টি কামনায় এ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।... এই যে মাটির ঘটকে মেঘ কল্পনা করে বারিবর্ষণের অনুকরণ এবং বিশ্বাস এর ফলে আসল মেঘ থেকে বারিবর্ষণ ঘটবে, এখানেই অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। এখানে নাটক নেই কিন্তু নাটকের ভিত্তি যে অনুকরণমূলকতা তা এখানে পাওয়া গেল।"[৮]

এসব আলোচনার শেষে তিনি তাঁর বক্তব্যের যে সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন তাতে পাই "অনুকরণাত্মক অনুরূপ বহু অনুষ্ঠান সুপ্রাচীনকাল থেকেই লোকসমাজে প্রচলিত। খুব সম্ভব এ ধরনের যাদু অনুষ্ঠান কালক্রমে লোকনাট্য সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে।"[৯]

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিকও লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে জাদু অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্বীকার করেন। "মেছেনী : লোকনাট্যের সম্ভাবনা" প্রবন্ধে তিনি লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে একাধিক কারণ আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১০] তার একটি কারণ যে যাদু-অনুষ্ঠান সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — লোকনাট্যের উদ্ভবের পেছনে এই জাদু-অনুষ্টানের ভূমিকা সকলেরই কিছু-কিছু জানা আছে। মেছেনী ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে সেই জাদুর যোগটি এমনিতর : যেহেতু এই ব্রত কৃষিকর্মের সহায়করূপে নদীর উপাসনা, সেই হেতু সেই নদীর জলের জন্য বৃষ্টির অনুকরণ ও অভিনয় এই ব্রতের একটি বিশিষ্ট দিক।[১১]

যাদু ছাড়াও ক্রীড়ানুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রভৃতিও লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। যাদু অনুষ্ঠানের যে ভূমিকাই আদি নৃত্য বা সঙ্গীতের উদ্ভবের মূলে থাকুক না কেন বর্তমান লোকনাট্যগুলির সঙ্গে তার যোগ প্রায় ছিন্ন। এই যাদু-অনুষ্ঠানগুলি লোকসমাজে নাট্যবিকাশের ঊষাকালের সূত্র সন্ধানে কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। যাদু অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই ধর্মীয় আচারগুলি যথাযথ রূপে পালন করবার জন্য এই সঙ্গীত নৃত্য স্তব ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ধর্মীয় কৃত্য যে লোকনাট্যের উৎস সে বিষয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের বিশ্লেষণ — "ভারতের নানা তিথি পার্বণ, বছরের এক একটি সময় ও ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা যাত্রা ও উৎসব ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য মূলত গড়ে উঠেছে।"[১২]

লোকজীবনের নানা অনুষ্ঠান — যেমন গ্রামদেবতার পূজা পূর্বপুরুষের স্মরণ শস্য রোপণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আলোচনা করে তিনি বলেছেন। "এই সব অনুষ্ঠানের কালে নানা সামাজিক ও সাময়িক ব্যাপার নিয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত কিন্তু অলিখিত মৌখিক নাট্য নাটিকা অভিনীত হত, এখনও হয়।"[১৩]

নির্মলেন্দু বুর উপরোক্ত মন্তব্যের পাশে আর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি 'মেছেনী লোকনাট্যের সম্ভাবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন — ' লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে একাধিক ঘটনা ও কারণ আছে। তার মধ্যে একটি কারণ : Play-Molif'[১৪] কাজেই লোকশ্রুতিবিদ্‌দের ধারণা অনুসরণ করে লোকনাট্যের উদ্ভবের মূলে যে কারণ পাওয়া যায় তার মূল নিহিত আছে লোককৃত্যের মধ্যে। একথা ঠিকই যে প্রাচীন যাদু-বিশ্বাস প্রায় সব জাতির মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে প্রচলিত ছিল। তার পাশাপাশি নাট্য ধর্মোৎসব বা ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান পালিত হত। এইগুলির অনুকৃতির দ্বারা লোকনাট্য সৃষ্টি হওয়া অনুমাননির্ভর হলেও তা যুক্তি বিরোধী নয়।

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'নটনাট্য নাটক' গ্রন্থে ঋগ্বেদের কোনো কোনো সূক্তের সংলাপের মধ্যে নাট্যবীজ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ইন্দ্র-বসুও সংবাদ বা জুয়াড়ির দশা ইত্যাদি আখ্যানগুলির মধ্য থেকে এই নাট্যবীজের সন্ধান পেয়েছেন। এরকম অনেকগুলি উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সূক্ত ঋগ্বেদে দেখা যায় যার ভিতর একটা গল্পও আছে। এই সংলাপাত্মক সূক্তগুলির মূল তাৎপর্য আবিষ্কার করা দুরূহ। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই সব উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে নাট্যবীজ খুঁজেছেন। ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদের এরকম একটি সূক্তে (১.১৬৫) প্রাচীন অভিনয় প্রয়াস বা অনুকরণ ধর্ম দেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এই সূক্তটি যেন পুরোহিতেরা অনুকরণ বা অভিনয় করছেন। এই মত Sylva Levi মেনে নিয়েছিলেন এবং A.B. Keath এগুলির মধ্যে পেয়েছিলেন নাট্য দৃশ্য, যেগুলিতে পুরোহিতেরা assumed the roles of gods and sages in order to imitate on earth the events of the heavens.[১৫] বৈদিক ক্রিয়ার মধ্যেও যে নাট্যধর্ম ছিল কীথের লেখা থেকে তা জানতে পারি। সুকুমার সেন এইসব সংলাপাত্মক সূক্তগুলিকে বলেছেন 'কথাকাব্যনাট্য' বা 'নাট্যকাব্য কণিকা'[১৬]।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। লোকনাট্যই সবনাট্যের আদিরূপ। সেই লোকনাট্যই কালক্রমে সাহিত্যিক পূর্ণতা লাভ করেছে নাগরিক পরিবেশে। পৃথিবীর সব দেশেই এইভাবে আদি ধর্মানুষ্ঠান বা লোক-কৃত্যের ভিতর থেকে নাট্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। আচার মূলক নৃত্য ও গীত এবং সংলাপ থেকে ক্রমে এই নাট্যরূপের জন্ম হয়েছে। কালক্রমে তার আদি ধর্মীয় সংস্রব বা কৃত্য সম্পর্কিত আচারের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার ধর্মীয় সূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি — যাত্রার ভিতরে তার সেই মধ্যকালীন পর্ব রয়ে গেছে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ বাংলা লোকনাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটু ভিন্নভাবে লোকনাট্যের উৎস বিচার করেছেন। তিনি নাটকের উৎস সন্ধান করেছেন মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। তিনি বাহ্যত যাদু অনুষ্ঠানের নামোল্লেখ করেননি। তিনি নাটকের উৎস বিচারে মানুষের ভাবাভিব্যক্তির উপর নির্ভর করেছেন। "নাটকে মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাতময় গতিশীল ও উদ্বেজিত অবস্থার প্রকাশ ঘটে।"[১৭] এই চিত্তবৃত্তির রূপ যেখানেই প্রকাশ পায় সেখানেই

আছে নাটকের বীজ। নাটক সৃষ্টির প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছেন — "যখনই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কোনো আনন্দ অথবা বেদনায় প্রবলভাবে আলোড়িত হয় তখন তার স্নায়বিক উত্তেজনাকে সে শুধু নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমেই ব্যক্ত করতে পারে।... নাটকের মধ্যে সম্মিলিত মানুষের আকস্মিক আঘাতে উদ্বেলিত চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশীলতার পরিচয়ই পাওয়া যায়।"[১৮]

নাট্য সৃষ্টির আগে মানুষের এই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটত নৃত্যে। সুতরাং তিনি নৃত্যের মধ্যে নাটকের উৎস সন্ধান করবার পক্ষপাতী। ফ্রেজারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি আদিম জাতির নানা সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানে প্রচলিত নৃত্যের কথা বলেছেন। যুদ্ধে জয় বা বৃষ্টি আনয়ন ইত্যাদি ক্রিয়ার জন্য নৃত্যই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি। এসব ক্ষেত্রে যাদু-ক্রিয়ার কথা অন্য গবেষকেরা উল্লেখ করলেও তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তার বক্তব্যের গহনে হয়ত সেই যাদু-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াদি অনুকরণ করে দেখানো হত এই অনুকরণের মধ্যেই নাটকের বীজ নিহিত ছিল। যারা অনুকরণ করত তারা ক্রমে ক্রমে এক একটি নাটকীয় চরিত্রে পরিণত হত। শত্রুহননের সমস্ত জয়ী যোদ্ধার শক্তি ও পরাক্রম যেমন ভাবাভিব্যক্তিপূর্ণ নৃত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হত তেমনি পরাজিত ও পলায়নরত শত্রুর দুর্বল ও ভয়ত্রস্ত ভাবও অনুকরণ করা হত...। অসভ্য জাতিদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনা নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হত।[১৯]

ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হল সঙ্গীত। দ্রুত লয়ের অঙ্গ সঞ্চালন সংযত হয়ে ধীরে ধীরে ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের স্থানে আসে আবৃত্তি। এই আবৃত্তি ইচ্ছ ও আবেগ-প্রকাশক ভাষারূপ আশ্রয় করে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একটা কাহিনীগত ঐক্য গড়ে তোলে। "এই ভাব প্রকাশক অঙ্গ সঞ্চালন, অর্থজ্ঞাপক আবৃতি এবং ঐক্যবদ্ধ কাহিনী থেকেই জন্ম নিল নাটক।"[২০]

এই নৃত্য গীতানুষ্ঠানের আলোচনা সূত্রে তিনি গ্রীক নাটক, চীনা নাটক জাপানী নাটক ও ভারতীয় নাটকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং এসবক্ষেত্রে নৃত্যের ও সঙ্গীতের ভূমিকাই যে কালক্রমে নাট্যরূপে বিকশিত হয়েছে তার কথা বলেছেন।

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ নাটকের উদ্ভবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার পিছনে আনুষ্ঠানিকতা অপেক্ষা চিত্তবৃত্তির উত্তেজনার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ড. ঘোষের মতানুসরণ করে আমরা বলতে পারি এই লোকনাট্যই হল আদি নাট্যরূপ। কালক্রমে তা থেকে নাগরিক নাট্যরূপের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু লোকনাটকগুলি লোকসমাজের মধ্যেই পুরানো রূপে বা সামান্যকিছু পরিবর্তিত হয়ে থেকে গেছে। লোকনাট্যগুলির ভিতর থেকেই এসেছে যাত্রানুষ্ঠান। কিন্তু কালক্রমে তারও নানা পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলি দীর্ঘকাল

ধরে এ অঞ্চলের মানুষের নাট্য রসপিপাসা মিটিয়ে আসছে। কিন্তু তার প্রাচীন রূপেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। মঞ্চ চরিত্রের সাজসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন দেখা যায় তবু সেখানে লোকনাট্যের প্রাচীন রূপটি অনেকটাই অবিকৃত থেকে গেছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও লোকনাট্যের সূত্র থাকতে পারে। বিবাহ অনুষ্ঠান, লোকক্রীড়া বা বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে তার উৎস যে থাকা সম্ভব সে বিষয়ে আগেই পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করেছি। এখানে একটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যেতে পারে। মানস মজুমদার লিখেছেন —

বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গেও লোকনাট্যের যোগ আছে। বাংলা বিহার সীমান্ত অঞ্চলে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের গ্রামে উপস্থিত হলে উভয়পক্ষে যুদ্ধে অভিনয় হয়। যুদ্ধে কন্যাপক্ষকে পরাজিত করে বলপূর্বক কন্যাকে নিয়ে যাওয়াই হল পাত্রপক্ষের উদ্দেশ্য। বলপূর্বক কন্যা অপহরণ বিয়ের একটি আদিম প্রথা। অতীতের সেই প্রথা স্মরণেই ঐ অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন।[২১]

লক্ষণীয় যে বিবাহের আচার পালন হল একটি পুরানো প্রথার অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান। আমরা যখনই কোনো আচার পালন করি সেই পুরানো প্রথাটিকেই যথাযথরূপে অনুকরণ করতে চাই। এটি প্রাচীন প্রথার লোকাভিনয়। সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্মে এই অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। যেমন গাছ প্রতিষ্ঠা, বন্ধুত্ব স্থাপন, পূজা উৎসব — সবই এক অর্থে পুরানো প্রথার অভিনয়। প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়ার সংলাপগুলিকে সেই প্রাচীন নাট্যের অভিনয় বলা যেতে পারে।

লোকনাট্যের উৎস সম্বন্ধে মোটের উপর একটা ধারণা নেবার পর এই লোকনাট্যের প্রকৃতিবিচার করা দরকার। এ বিষয়ে বিদ্বজনের ধারণা অনুসরণ করেই আমরা তার প্রকৃতি পরিচয় গ্রহণ করব।

লোকনাট্য সম্পর্কে প্রথমেই আশুতোষ ভট্টাচার্যের ধারণা উল্লেখ করা যায়। লোকনাট্য সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন - দুটি রচনা অনুসরণ করে আমরা সে ধারণার পরিচয় দেব। উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি বর্তমানে সনৎমিত্র সম্পাদিত বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই লেখাটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৭৫ সালের রচনা হওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ১৯৮২ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থ 'বাংলার লোকসংস্কৃতি'তে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই দুই সূত্র থেকে ধারণা গ্রহণ করে লোকনাট্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

কুশান যে রামায়ণনির্ভর নাটক সেকথাও উল্লেখ করেছেন। 'উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন — "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[২২]

এই প্রসঙ্গের আলোচনা সূত্রে তিনি আরও বলেছেন তার ''বিষয়বস্তু জনসাধারণের জীবনভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না।''[২৩] এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন পৌরাণিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের মনে একটি অপরিবর্তনীয় সংস্কার আছে। তাই তার লোকনাট্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই কারণে উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, আলকাপ কুশান এবং বিষহরা গানকে লোকনাট্য বলে মেনে নিতে চাননি। ''এদের মধ্যে একটিকেও লোকনাট্য বলে গ্রহণ করা যায় না।'' গম্ভীরা ও আলকাপে আনুপূর্বিক কাহিনীর অভাব এবং কুশান ও বিষহরার[২৪] পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নাট্যরূপ গড়ে ওঠার কারণে এগুলিকে তিনি লোকনাট্য বলে স্বীকার করতে চাননি।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলিকে আমরা এভাবে সাজিয়ে দিলাম —

১। নায়ক নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম্য নরনারীর প্রতিনিধি।

২। নাটকের বিষয় গ্রামজীবনভিত্তিক। যে বৎসর গ্রামে যে সব প্রণয়মূলক ঘটনা ঘটে তাই নাট্য কাহিনীতে সঙ্গীতে সংলাপে ও নৃত্যের মধ্যে রূপায়িত হয়। সুগভীর প্রণয়মূলক কাহিনীই এর বিষয়। সত্যমূলক ঘটনাই তাদের ভিত্তি।

৩। প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার কৃত্রিমতা নেই।

৪। সাজ সজ্জার ও পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর নেই

৫। সাজঘর নেই

৬। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের মধ্যে বসে এবং প্রয়োজনমত অভিনয় করে।

৭। সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়।

৮। কাহিনীর সূচনা ক্রমোন্নয়ন ও স্পষ্ট পরিণতি আছে।

৯। প্রতি বছরই নূতন কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ হয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি লোকনাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য বলেছেন। যে নাটকে এ বৈশিষ্ট্যের অভাব তাকে তিনি লোকনাট্য বলতে রাজী নন।

অবশ্য ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে সংজ্ঞা একরকম রেখেও

বিচারে একটু শিথিল মনোভাব দেখিয়েছেন। সেখানে লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছেন এভাবে : লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়। তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোনো ধারা কিংবা ঐতিহ্যও থাকে না।[২৫]

লক্ষণীয় যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলা লোকসাহিত্যের একজন বহু খ্যাত গবেষক। তিনি যে সংজ্ঞাটি নিরূপন করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। লোক জীবনাশ্রিত সাহিত্য অর্থেই তিনি লোকসাহিত্য কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। তাতে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ স্বীকার করতে চাননি। যে নাট্যরূপ লোক জীবনাশ্রিত তাই তাঁর মতে লোকনাট্য। কাজেই তার সংজ্ঞাটিকে বলা যায় লোকসাহিত্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা লোকনাট্যের সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটিকে লোকনাট্যের ক্লাসিক সংজ্ঞা বলা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থেই তিনি এই সংজ্ঞাটি থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন এবং একটু শিথিল ভাবেই লোকনাট্যের বিচার করেছেন। তিনি লিখেছেন "গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণীর নাটক অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে।"[২৬] এবং সাধারণ দর্শকদের মধ্যে এমন অনেক নাটক লোকনাট্য হিসাবে গৃহীত হচ্ছে যার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর অভাব রয়েছে। তিনি লোকনাট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সেখানে কুশান গম্ভীরা আলকাপকেও গ্রহণ করেছেন। তবে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যেতে পারে। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' একটি ছোট handbook মাত্র। এখানে গবেষণা নির্ভর প্রকৃতিনির্ধারণ অপেক্ষা তার পরিচয় দেওয়াই বড় কথা। হয়তো সে কারণেই তিনি এর মধ্যে একটু শিথিলতা দেখিয়েছেন। 'উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাটক' তেমন রচনা নয়। কাজেই অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামত সেখানে অত্যন্ত দৃঢ়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতটি অবশ্য উত্তরকালের গবেষকেরা আর তেমন কঠোর ভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী নন। ড. সনৎকুমার মিত্র তাঁর গ্রামীণ লোকনাটক নিবন্ধে এ প্রসঙ্গেই বলেছেন "অত সংকুচিত সংজ্ঞায় বেঁধে বাঙলার গ্রামীণ লোকনাটকগুলিকে বিচার করতে চান না।"[২৭]

অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' বইতে লোকনাট্য সম্পর্কে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মোটের উপর আশুতোষ ভট্টাচার্য নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলির অনুরূপ। সংক্ষেপে এগুলির মূল কথা হল :

১। লোকনাট্য গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যেই উদ্ভূত হয় এবং সাধারণ লোকেদের কাছে পরিবেশিত হয়। রচয়িতার নিজস্ব ভাবপরিকল্পনা এতে প্রাধান্য পায় না ঐতিহ্যগত কাহিনীই এতে অবলম্বন করা হয়। কোনো আঞ্চলিক মানবগোষ্ঠীর আদিম বীরত্ব ও কীর্তিগাথা এর কাহিনীধারার মধ্যে মিশে থাকে।... লোক নাট্যের

মধ্যে আঞ্চলিক পটভূমি জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে। স্থানীয় প্রকৃতি ও লোকজীবনধারার চিত্র এতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

২। লোকনাট্যে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য দেখা যায়।

নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মিলিতভাবে পরিবেশিত হয়।

৩। লোকনাট্যের সংলাপ সুরেলা ও আবৃত্তিধর্মী; তার ভাষা আঞ্চলিক ভাষা সংলাপে কবিত্বের ভার প্রায়ই থাকে না।

৪। "লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক। দেবদেবীর মহিমা, মানবশক্তির উপর দৈব শক্তির প্রাধান্য এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়। ... পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয়, নীতির পুরস্কার ও দুর্নীতির শাস্তি... দেখানো হয়। মানুষের বিশ্বাস, ত্যাগ ও ভক্তি জাগিয়ে তোলাই লোকনাটকের উদ্দেশ্য। তাই লোকনাট্যের প্রধান লক্ষ্য হল লোকশিক্ষা।"

৫। খোলা আসরে লোকনাটকের অভিনয় হয়। সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তির চেয়ে একটু অতিরঞ্জিত — অতি নাটকীয় অভিনয়ই লোকনাট্যের বিশিষ্ট্য।

লক্ষণীয় যে অধ্যাপক অজিত ঘোষ যেভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করেছেন তাকে বলা যেতে পারে লোকনাটকের বর্ণনামূলক পরিচয়। আশুতোষবাবু লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছিলেন অনেকটা নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি মনে ভেবেছিলেন লোকনাট্য লোকজীবনের কথা বলে তাতে পৌরাণিকতা বা ঐতিহাসিকতার প্রবেশ নিষেধ। তাকে হতে হবে লোকজীবনের লোক অভিনীত লৌকিক কাহিনী নির্ভর নাটক। অজিতবাবু তা করেননি। আশুতোষবাবুর সঙ্গে যেখানে তিনি আলাদা তা এই কাহিনীর চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে। আশুতোষবাবু পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর নাটককে লোকনাট্য বলতে চান না, অজিতবাবু তাকে অম্লানবদনে স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। বিশেষত স্ত্রীপুরুষঘটিত প্রেম কাহিনীকেই আশুতোষবাবু লোকনাট্যের কাহিনী বলেন — অজিতবাবুর সে সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নেই। সাজসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছিদ, মুক্ত মঞ্চ ইত্যাদি ব্যাপারে দু'জনের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আশুতোষবাবু যেখানে সংলাপকে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত বলতে চান (entempore) অজিতবাবু কিন্তু তাতে একটু আধটু অলংকার এবং কবিত্ব থাকতে দেখেন — তাৎক্ষণিকতার দাবী নেই তাঁর। যেহেতু লোকনাট্যের কোনো নির্দেশিকা তিনি রচনা করছেন না — কাজেই পূর্ব রচিত বা পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর নাটক সম্পর্কেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আশুতোষবাবু যেখানে গোষ্ঠীজীবনের সম্মিলিত প্রয়াসের কথা আলোচনাই করেন না সেখানে অজিতবাবু সেই বৈশিষ্ট্যটি লোকনাট্যে রূপায়িত হতে দেখতে চান। আশুতোষবাবু যেখানে লোকানাট্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব সেখানে

আজিতবাবু লোকশিক্ষাকে লোকনাট্যের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখতে চান।

এঁদের পর যাঁরা লোকনাট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের আলোচনা মোটের উপর এই দুই আলোচনার ধারাই অনুসরণ করে চলেছে। কিংবা বলা যায় এঁদের আলোচনার মধ্যেই লোকনাট্যের মূলসূত্রগুলির কথা বলা হয়ে গিয়েছিল — কাজেই পরবর্তী আলোচকেরা সেগুলিকেই নিজের মতো করে বলেছেন। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ গ্রন্থ (১৯৯৫) লিখেছেন। ''লোকনাট্য মুক্ত অঙ্গনে — ... অভিনীত হয়। মোটামুটি একটা কাহিনী বাঁধা থাকলেও সংলাপের অনেকাংশই তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় বহু সময়ে। গান, নাচ এবং সংলাপ এখানে হামেশাই একে অন্যের বিকল্প-বা-পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় কাহিনী, পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অসঙ্গতিই মোটামুটিভাবে এই জাতীয় নাটকের উপজীব্য। আর প্রায়শই, এগুলি প্রকারান্তরে লোকশিক্ষা-তথা-গণজ্ঞাপন মাধ্যম রূপে গণ্য হয়। অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ — এই নাটকগুলির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ।''[২৮]

এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশক বাক্যগুলিতে পূর্ববর্তী অধ্যাপক অজিত ঘোষ নির্দেশিত লক্ষ্মণগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু দুটি নূতন কথা এতে যুক্ত হয়েছে। এগুলি 'সামাজিক অসঙ্গতি'কেই তুলে ধরে আর অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ এগুলির চরিত্রলক্ষণ। বলাবাহুল্য এই দুটি কথা যুক্ত হবার ফলে লোকনাট্যের চরিত্রও গণনাট্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কারণ যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের কথা এইসব নাটকে দেখানো হয় এবং পুণ্যের জয়ই তার শেষ লক্ষ্য তবু তাকে প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটক বলা যায় না। এখানে লোকনাট্যের চরিত্র লক্ষণ ঠিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হয়নি হয়েছে অনেকটা নির্দেশমূলকভাবে। অন্যলক্ষণগুলিতে বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে নি।

অধ্যাপক মানস মজুমদার লোকনাট্যের প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। এগুলিকে সংক্ষেপে সাজিয়ে নিলে পাই —

১। লোকনাট্য লোকসংস্কৃতিরই একটি দিক।

২। তার বিষয়বস্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা দৈনন্দিন জীবননির্ভর।

৩। তার প্লট শিথিল, চরিত্রগুলি দেশের জল মাটি থেকে উদ্ভূত।

৪। সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এবং বহুক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক।

৫। নৃত্যগীত ও সংলাপের ত্রিবেণী সংগম তাতে ঘটেছে।

৬। মুক্ত মঞ্চেই তার অভিনয় হয়।

৭। নিছক মনোরঞ্জন তার উদ্দেশ্য নয়; অন্যায় অবিচার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে তাতে প্রতিবাদ করা হয়।

লক্ষণীয় এই বৈশিষ্ট্যগুলি মোটের উপর সব লোকনাট্য-বিশেষজ্ঞের লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রকৃতি নির্দেশ থেকে যেখানে আধুনিককালের বিশেষজ্ঞদের প্রভেদ তা হল এই যে এঁরা তার মধ্যে মনোরঞ্জনই শুধু দেখেন না অন্যায় অবিচার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ও দেখতে পান। আমাদের এই অভিসন্দর্ভে কয়েকটি নির্বাচিত লোকনাট্যের সংকলন সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলিতে ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্বে, পাপ-পুণ্যের বিরোধে ন্যায় বা পুণ্যই জয়যুক্ত হয় বটে কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত এতে দেখা যায় না। একথা ঠিক এই নাট্যগুলির বাইরে বৃহৎ বঙ্গে এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিশ্চয় আছে। যেখানে এরকম প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আমাদের আলোচ্য গম্ভীরা লোকনাটকেও তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা লক্ষণীয় জিনিস হল এই যে আশুতোষবাবুর সংজ্ঞায়নে বা প্রকৃতি লক্ষণে এর উল্লেখ ছিল না। সনৎকুমার মিত্র আশুতোষবাবুর সংজ্ঞার ভিত্তিতে যে দশটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন সেগুলিকে নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল —

১। মুক্ত মঞ্চে লোকনাটকের অভিনয় হয়; তাতে সাজঘর নেই

২। বাদ্যকারেরা মঞ্চের মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে বাজনা বাজান; অভিনেতারা তাঁদের ঘিরে অভিনয় করেন।

৩। প্রত্যেকটি পালাই আঞ্চলিক।

৪। সংলাপগুলি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত।

৫। লোকনাট্যগুলি সবই সঙ্গীতনির্ভর।

৬। "গ্রামীণ লোকনাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এরা একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম-সম্প্রদায়কে কোনো ভাবেই আঘাত বা ব্যঙ্গ করে না। এদের দর্শকেরাও কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।"

৭। আঞ্চলিক ও লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার।

৮। পোষাকের আড়ম্বর নেই।

৯। "কোন কোন পালা আনুষ্ঠানিক, একটা ritual-কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় (যেমন গম্ভীরা, বোলান ইত্যাদি) আবার কোনটি বা কেবলই আনন্দোপভোগ করবার জন্য (functional)।"

১০। "গ্রামীণ লোকনাটকের প্রায় অনেকগুলিতে একটি ভাঁড় চরিত্র উপস্থিত থাকে। বিচিত্র তার সাজপোষাক।

... সে প্রায় সারা পালায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে। মূল নাট্য সংলাপের এক আধটা শব্দ তুলে নিয়ে সরস মন্তব্য করে। দর্শকেরা প্রাণভরে হাসতে থাকে।''[২৯]

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা পড়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিশিষ্ট্য এতে ধরা পড়েছে তা হল লোকনাট্যের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। লোকসাহিত্যের যে কোনো রূপই অসাম্প্রদায়িক। তা লোকের সৃষ্টি, লোকের জন্য সৃষ্টি কিন্তু তাতে লোক চরিত্রের জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ভেদ নেই। এখানে তার বড় জিৎ। সনৎবাবু এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করেছেন। কিন্তু সনৎবাবুর লেখার মধ্যেও লোকনাট্যের প্রতিবাদী চরিত্র লক্ষণের কোনো কথা নেই। তিনি বরং পালাকে আনুষ্ঠানিক ও আনন্দোপভোগের জন্য রচিত বলে তার দুই ধরনের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। যে পালাগুলিকে তিনি আনুষ্ঠানিক বলেছেন সেগুলির আনুষ্ঠানিক চরিত্রও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সেসব গম্ভীরাকে তিনি আনুষ্ঠানিক পালা বলেছেন। কিন্তু গম্ভীরা পালা যে আনুষ্ঠানিকতার সংশ্রব হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ড. প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ গম্ভীরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন — ''একদা গম্ভীরা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই সম্পর্ক হারিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।''[৩০]

পুষ্পজিৎ রায়ও লিখেছেন ''উৎসব-অনুষ্ঠান-নিয়মবিধি এবং গম্ভীরাকেন্দ্রিক আরও অন্যান্য আচার আচরণের সঙ্গে লোকনাটক গম্ভীরা গানের অর্থাৎ পালাধর্মী গম্ভীরা গানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছে।''[৩১]

কাজেই লোকনাট্যের যে অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা সনৎবাবু লিখেছেন সে বিষয়ে কোনো মত পার্থক্যের কারণ নেই। ড. সনৎ কুমার মিত্র আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেটি হল ভাঁড় চরিত্রের উপস্থিতি। এই শ্রেণীর একটি চরিত্র উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলিতে অন্য নামে উপস্থিত থাকে। সে দোয়ারি। তার কাজ মূল গীদালের সহযোগিতা করা। সে মূল গীদালের গানের কথা নিয়ে প্রশ্ন করে ব্যাখ্যা করে রসিকতা করে। ''দোয়াড়ী'' হাস'য়-কাঁদায়, আনন্দে ভাসায়।[৩২] উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে হাস্যপরিহাস ব্যঙ্গ রসিকতা করবার মতো একটি চরিত্র। সুতরাং সনৎ কুমার মিত্রের এই মন্তব্য খুবই ঠিক যে লোকনাট্যে ভাঁড় জাতীয় একটি চরিত্রের উপস্থিতি থাকে। প্রয়োজন বিশেষে তার মাধ্যমে অন্য কোনো ভূমিকারও অভিনয় করানো হয়।

সনৎবাবুর বক্তব্যের সার সংকলন করলে মোটের উপর লোকনাট্যের মনোরঞ্জনকারী প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়। আর অজিতকুমার ঘোষ যে বলেছিলেন তাতে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় দেখনো সেও এই লোকনাট্যের বিষয়ের মধ্যে দেখা যায়। পাপের পরাজয় অপেক্ষা বরং মন্দ চক্রান্তকারীর চক্রান্ত ভেস্তে যাওয়ার এবং পরিণামে খেসারত দেবার ব্যাপার লোকনাট্যের পালায় দেখানো হয়। যেমন পালাটিয়া খাস পাঁচালী

নাটকে লোভী জোতদার পালায় লোভী জোতদারের পরস্ত্রী লিপ্সা যেভাবে প্রতিরুদ্ধ হয় এবং যেভাবে তার কন্যার বিয়ে দিয়ে একটা সুখী এবং আনন্দকর পরস্থিতিতে নাটক শেষ হয় তাতে দর্শককুল আনন্দ নিয়েই ঘরে ফেরেন। লোভী জোতদারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া এবং তার কিঞ্চিৎ খেসারত দেওয়ার জন্য সাধারণ দর্শকের মনে একটা পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে। তবে কোচবিহারের দোতরা পালা 'আলম সাধু'তে শেষ পর্যন্ত রহিম সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কাহিনী বিন্যাস লক্ষ করলে তাকে ঠিক পাপের পরাজয় বলা যায় না।

লোকনাট্যের সম্বন্ধে মানিক সরকার অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি 'বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও আলকাপ' নামক একটি প্রবন্ধে অজিতকুমার ঘোষ নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন। সে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের আলোচনায় আগেই অন্যান্য গবেষকের কথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন —

১। লোকনৃত্য লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ।

২। ব্যঙ্গবিদ্রূপ হাস্য কৌতুক তার একটি লক্ষণ।

৩। লোকনাট্যগুলি প্রধানত অলিখিত।

বলা বাহুল্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি অজিতকুমার ঘোষ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। লোকনট্যের সাধারণ লক্ষণ প্রসঙ্গে "তিনি লিখেছেন লোকনাট্য প্রায় সর্বত্রই সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকে উৎপন্ন হয়"[৩৩]। কাজেই মানিকবাবুর সংযোজনটি তাৎপর্যহীন। লোকনাট্যের অলিখিত রূপের তত্ত্ব আশুতোষবাবুর মূলতত্ত্ব। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে লিখিত সংলাপ বলার আবশ্যকতা না থাকলেও লোকনাট্যের একটা লিখিত খসড়া অনেক সময় পাওয়া যায়। বরং অজিতবাবুর যে মতটি সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন তা হল কাহিনীর ধর্মীয় চরিত্র। তিনি বলেছেন "লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক"[৩৪]। সম্ভবত তিনি 'ধর্মমূলক' কথাটির দ্বারা বিষহরা নাটকের দেবী মনসার কথা মনে রাখেন তেমনি গম্ভীরার শিবের প্রসঙ্গও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। উপরন্তু কাহিনী হিসেবে কুশাণগানে রামায়ণ কথার ব্যবহারও এসে যায়। কাজেই ধর্ম কথাটিকে ঠিক religion অর্থে ব্যবহার না করে একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। অজিতবাবু হয়তো সেই কারণেই ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা এনেছেন এবং পুণ্যের জয় দেখানোর কথা বলেছেন। লোকশিক্ষা তাঁর মতে লোকনাট্যের উদ্দেশ্য; তিনি অবশ্য প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথ ধরেন নি।

লোকনাট্য সম্পর্কে এখন পণ্ডিতমণ্ডলী ও গবেষকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অনেকেই এসব বিষয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই আলোচনাগুলি মোটের উপর পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যানুসারী। সেখানে হয়ত নূতন

কোনো কথা বলবার বিশেষ অবকাশও নেই। এই প্রেক্ষিতে আমরা লোকনাট্যের প্রকৃতিকে কয়েকটি সূত্রে নিরূপিত করে ফেলতে পারি। বলা বাহুল্য এ কেবল গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা মাত্র।

লোকনাট্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় —

১। এগুলির বিষয়বস্তু পুরাণ কিংবদন্তি বা লোকজীবন থেকে গৃহীত হয়। মানব-রসই এসব কাহিনীর উপজীব্য। এর বিষয়বস্তুকে মানস মজুমদার সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল —

(ক) পুরাণ নির্ভর

(খ) লৌকিক দেবদেবী মহাপুরুষ ও পীর মাহাত্ম্যমূলক

(গ) রূপকথা আশ্রয়ী

(ঘ) আরব-পারস্যের কাহিনী-আশ্রয়ী

(ঙ) স্থানীয় ইতিহাস আশ্রয়ী

(চ) সামাজিক প্রসঙ্গ আশ্রয়ী

(ছ) হাস্যকৌতুক মূলক

লক্ষণীয় যে বর্তমান গবেষণায় কেবল অবৈধ প্রেমের সামাজিক কাহিনীকেই আর লোকনাট্যের বিষয় বলে গ্রহণ করা হচ্ছে না। কিংবা ধর্মীয় প্রসঙ্গকেও লোকনাট্যের বিষয় বহির্ভূত বিবেচনা করা হচ্ছে না। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ব্যাপক — এবং তার ভিতরে লোকনাট্যের প্রচলিত সব কাহিনীকেই ধরে নেবার প্রবণতা আছে। লোকনাট্যের কাহিনী যেখান থেকেই আসুক না কেন লোকজীবন ধর্মানুগত তার প্রয়োগ পদ্ধতিই লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

২। তাই লোকনাট্যে চরিত্রগুলি যেখান থেকেই আসুক না কেন তাতে লোক জীবনেরই প্রতিফলন দেখা যায়। মানসবাবুর মত এই যে "লোকনাট্যের চরিত্রগুলি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত"[৩৫] হবে একথা স্বীকার্য। আমাদের কুশান পালার রাম লক্ষ্মণ, রাজধারী পালার রাম রাবণ গম্ভীরা পালার শিব সবই এই উত্তরবঙ্গের জল মাটির মানুষ। তারা পুরাণ থেকে এলেও কোনো পৌরাণিক মহিমা তাদের চরিত্রে নেই। এই উত্তরবাংলার একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো পার্থক্য নেই।

৩। লোকনাট্যের সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এবং লোকমুখের কথিত ভাষা। তাতে গদ্য পদ্য সঙ্গীত তিনেরই প্রয়োগ হয়। গদ্য পদ্য সংলাপ সংগীতে পুনরুক্ত হয়ে থাকে। মূল গীদাল যা পদ্যে বা সঙ্গীতে

ধারাবহী গ্রামীণ মানুষকেই বোঝায়। লোকসংস্কৃতি সামগ্রিক লোকসমাজের সংস্কৃতি, সংহত সমাজের সমষ্টিগত জীবনচর্যার সামগ্রিক কৃতি[৩৬] লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছিলেন তা ''সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়''[৩৭]। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। একে কেউ বলেছেন লোক ঐতিহ্যের একটি দিক[৩৮] কেউ বলেন এর মধ্যে ''সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত চিন্তা ও অনুভূতিই প্রতিফলিত হয়।[৩৯]

উচ্চ সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে লোকসংস্কৃতির স্থান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় তার স্থান আদিম সংস্কৃতির (Primitive Culture) পরের ধাপে; তার ভিতর থেকেই ক্রমে উচ্চ সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই মধ্যস্তরের সভ্যতাকে আশুতোষবাবু বলেছিলেন সংহত সমাজের সংস্কৃতি, তাদের সংহত সমাজের পট ভূমিতে ''সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন প্রয়াসের সূত্রে ঐতিহ্যমূলক লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ''[৪০]। সংহত সমাজের ধর্ম ঐতিহ্যরক্ষা করে চলা, অল্পসল্প বহিরাগত উপকরণসমূহ সে ''নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে''[৪১]। ''কৃষিভিত্তিক পল্লীসমাজের সমষ্টিগত পর'পর সাপেক্ষ আর্থ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ জনসমাজই মুখ্যত সংহত সমাজ।''[৪২] লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য এই সমাজের সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতির বিপরীত কোটিতে অবস্থিত যে উচ্চ সংস্কৃতি তা এই লোকসংস্কৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছে। তা প্রধানত নাগরিক সমাজের সংস্কৃতি। নগরপত্তনের ফলে এই লোকসংস্কৃতির ধারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে লোকসংস্কৃতি অন্যভাগে উচ্চ নাগরিক সংস্কৃতি। এই উচ্চ নাগরিক সংস্কৃতির একটি প্রকাশরূপ হল আধুনিক নাটক। লোকনাটক গোষ্ঠী জীবনের কথা বলে।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীর মৌল সংস্কারগুলি লোকনাটকের মধ্যে নিহিত থাকবার ফলে ঐতিহ্যের পরিণাম তার মধ্যে অধিক। নতুন চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ সেখানে থাকত সামান্যই। অথচ আধুনিক নাটকে ঐতিহ্য ব্যাপরটি কেবল একটি সূত্রমাত্র, বাকি সবটাই বাইরের প্রভাব এবং নাট্যকারের নিজস্ব সৃজন শক্তির যোগফল। নাটক সমপর্কে যাঁর জ্ঞান বেশি, অভিনয় ক্ষমতা যাঁর আয়ত্তে এবং কল্পনাশক্তিতে যিনি ধনী তিনিই হতে পারেন আধুনিক নাটকের স্রষ্টা। স্রষ্টা কথাটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে লোকনাটকের কোনো লিখিতরূপ নেই। তা হলো মৌখিক। মৌখিকস্তরে কোনো সৃষ্টিকার্যই কখনও পূর্ণাঙ্গতা ও সার্থকতালাভ করতে পারে না, যেহেতু সংস্কারের, মার্জনার কোনো সুযোগ থাকে না সেখানে। কিন্তু আধুনিক নাটক লিখিত হয়। যতবার খুশি সংশোধন, পরিমার্জন ও রূপান্তর সাধন করে নাট্যকার তার অভীষ্ট শিল্পসিদ্ধিতে পৌঁছাতে পারেন। এমনকি কয়েকবার অভিনয়ের পরও এই রূপান্তর সম্ভব। শেকস্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে।

অন্যপক্ষে লোকনাটকের যে পরিমার্জন তা ঠিক এভাবে হয় না। মৌখিকরূপে থাকে বলে তা পরিবেশন করবার সময় প্রত্যেকবারই কিছু কিছু ভাবে বদলে যায়। লোক সাহিত্যের প্রধান ধর্মই এই যে "ইহার ধারা ক্রম পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার জীবনীশক্তি রক্ষা পায়"[৪৩]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের পার্থক্য খুব স্পষ্ট। লোকনাটক তার বিষয় নিয়েছে প্রাচীন পুরাণ থেকে, মিথ থেকে, ধর্মগ্রন্থ থেকে। লৌকিক প্রণয় কাহিনীও সে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যেখান থেকেই কাহিনী গৃহীত হোক না কেন তার মধ্যে লোকজীবনের ভাবনাই প্রধান। তাতে লৌকিক অভিজ্ঞতা, লোকজীবন ধর্ম এসবই বড় হয়েছে। কৃত্রিমতার জায়গায় তাতে এসেছে সহজসরল জীবনের বাস্তবতা। আধুনিক নাটক লোকনাটকের বিষয় গ্রহণ করেই ক্ষান্ত নয়। পুরাণ, মিথ ও কাল্পনিক বৃত্তান্ত ছাড়াও আধুনিক নাটকের বিষয়ের অভাব নেই। সমকালীন ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে প্রচুর একালে নাটক লেখা হয়েছে। মানুষের জীবনের জটিলতা, তার অবস্থাগত এবং ভাবগত সংকট একালের নাটকের বিষয়। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সবই তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সমাজ বাস্তবতাই তার মুখ্য বিষয়।

এ জন্য বলা যায়, লোকনাটকের আর আধুনিক নাটকের ভাবগতরূপ এক নয়। লোকনাটক প্রচলিত ধর্মবিধান, নীতিশাস্ত্র ও মূল্যবোধকে মান্য করে। উচ্চ সংস্কৃতির নাটক নতুন জীবনবোধ, ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের জন্ম দেয়। প্রচলিত পাপপুণ্যবোধ এনাটকে অস্বীকৃত হতে পারে। এমনকি পুরাণকে ভিত্তি করেও নাট্যকারেরা যখন নাটক লেখেন তখন পুরাণের অনেক ধারণা পাল্টে যায়, নতুন ভাষ্য রচিত হয়। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা, পাষাণী, ভীষ্মে'র কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু লোকনাটকের সেই অর্থে রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। অথচ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে একালে প্রচুর নাটক লেখা হয়।

আঙ্গিকের দিক থেকেও লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের পার্থক্য বহুবিধ। এর সঙ্গে অবশ্যই মঞ্চব্যবস্থা জড়িত হয়ে আছে। খুব প্রাথমিক এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকনাটক অখ্যানধর্মী। একটা ঢিলেঢালা গল্প বর্ণনা তার প্রধান আকর্ষণ। কখনও বা ব্যালাডধর্মী সঙ্গীতময়তায় তার পরিণতি। এমনকি মুখোশ নৃত্যের, পুতুলনাচের মোটা দাগের বর্ণনাকৌশলও গ্রহণ করে লোকনাটক। কিন্তু উচ্চসংস্কৃতির নাটক ভরতমুণির ভাষায় 'পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্'। অ্যারিষ্টটলের ভাষায় আদি মধ্য অন্ত্যসমন্বিত একটি নিটোল কাহিনীবৃত্ত বিশেষ বিদগ্ধ নাট্যকারদের বহু চর্চার মধ্য দিয়ে নাটক আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে পঞ্চ অঙ্কের মধ্যে দৃশ্যান্তর, সূচনা, অবরোহন, আরোহন, উপসংহার, ইত্যাদি কত যে সূক্ষ্মতর পর্যায় বিন্যাস আছে তা আঙ্গিক সচেতন মানুষ মাত্রই বোঝেন। আর সমস্ত কিছুই এ নাটকে ঘটে কার্যকারণ শৃঙ্খলা মেনে। অথচ লোকনাটকে ঐ সব সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাই যে নেই তা-ই নয়, কার্যকারণ সাযুজ্য রক্ষার ব্যাপারটিও সেখানে

202077

বলেন চরিত্রগুলি আবার কথোপকথনে তার প্রয়োগ দেখাতে পারে।

৪। লোকনাট্যের মঞ্চ সজ্জার কোনো আড়ম্বর থাকে না। সাধারণ মঞ্চে দর্শক পরিবেষ্টিত হয়েই তার উপস্থাপনা হয়। তবে ইদানীং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কখনো কখনো উচ্চমঞ্চে সেগুলির অভিনয় হচ্ছে। নূতন মঞ্চব্যবস্থা এখনো লোকনাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অভিনবত্ব সৃষ্টি করেনি। তবে মঞ্চ সজ্জার এই পদ্ধতি কার্যকরী হলে তার ঐতিহ্যানুসারী প্রয়োগ ব্যবস্থার বদল হতে বাধ্য। মঞ্চের আলোক সজ্জার এখনো কোনো বদল ঘটেনি।

৫। সাজপোষাকে বা মেকআপে কোনো আড়ম্বর নেই। সাজঘর নেই ঠিক বলা যায় না। কোন না কোনো ভাবে একটা সাজঘর থাকে। সেখানে শিল্পীরা বসেন — পোশাক পরিচ্ছদ বা মেকআপ করে থাকেন।

৬। নৃত্য লোকনাট্যের একটা আবশ্যিক উপাদান। মূল গীদাল গান করবার সময় ঠিক নৃত্য না করলেও তার অঙ্গভঙ্গিতে নাচের ছন্দ ফুটে ওঠে। দোয়ারি নৃত্য করেন। আবার ছুকরিদের নৃত্য উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। নৃত্যে আছে লোকজীবনের সরল ছন্দের ললিায়িত দেহভঙ্গির ব্যবহার। পদচারণায় এবং হাতের লীলায়িত ভঙ্গিমার ব্যবহারের বৈচিত্র্য তেমন কিছু নেই কিন্তু তার সৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

৭। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রভৃতির দ্বারা হাস্যরসের পরিবেশন এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রধানত দোয়ারিই এই ভূমিকা পালন করে

৮। লোকনাট্য বিশেষভাবে অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির রচনা। লোকসাহিত্যের যে কোন শাখা সম্বন্ধেই সে কথা বলা চলে। দেবদেবীর কথা থাকলেও তা নিয়ে কোনো সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর কিছু দেখা যায় না।

৯। লোক বাদ্যযন্ত্ররই এগুলির প্রধান উপকরণ।

১০। লোকনাট্যের উদ্দেশ্য লোক মনোরঞ্জনের দ্বারা লোকশিক্ষা। সাধারণত সহজ জীবননীতি ও সমাজ অনুমোদিত নীতিশিক্ষাই এর উদ্দেশ্য। আজকাল কিছু নাটক লেখা হচ্ছে — যা লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে — তার দ্বারা নানা ব্যবহারিক শিক্ষা — যেমন সর্ব শিক্ষার গুরুত্ব, জন্মনিয়ন্ত্রণ জন-স্বাস্থ্য পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচার করছে। এগুলি ঐতিহ্যবাহিত লোকনাট্য নয়।

লোকনাটকের সঙ্গে নাগরিক নাট্যকলার পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি মৌলিক ধারণার কথা বলতে হয়। লোকনাট্য লোকসংস্কৃতিরই একটি প্রকাশ রূপ। লোকসংস্কৃতির লোককথাটি ঐতিহ্য

অবান্তর। ফলতঃ, চরিত্রায়ণের ব্যাপারটিও এই দুই রীতির নাটকের মধ্যে দুই রকম। লোকনাটকের চরিত্র সমতল (Flat) ধরনের; কখনও বা টাইপ চরিত্র। আবার এমনও দেখা যায়, একই চরিত্র নানা চরিত্রের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। একই লোক মঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে একাধিক চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে যায়। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সক্রিয়তায় কিংবা কথোপকথনের গতিময়তায় লোকনাটকের চরিত্রের অগ্রসর হবার কোনো ব্যাপার নেই। সে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। বিশেষত পুরাণ বা মিথের চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব হতেই একটা ধারণা থাকে — সেই ধারণাকে নাটকের মধ্যে আর পরিবর্তিত হতে দেখি না আমরা। কিন্তু উচ্চ সংস্কৃতির নাটকে ঐ ধরনের চরিত্রগুলো আমাদের জানা পথ কখনও সম্পূর্ণ, কখনও বা অংশতঃ পরিত্যাগ করে। তাদের নবরূপান্তররের মাধ্যমে নাট্যকার আমাদের সামনে একটি ভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। আধুনিক নাটকে শুধু Flat বা Type চরিত্র নয়, জীবন্ত মানবিক চরিত্রও থাকে। নিজস্ব ভুলত্রুটি, মানবিক জটিলতা, বহুবিধ দ্বন্দ্ব নিয়ে, বহু ধরনের দুর্জ্ঞেয়তা দিয়ে আধুনিক নাটকের চরিত্রেরা সৃষ্ট। লোকনাটকের চরিত্ররা পূর্ব থেকেই রচিত। নাটকে শুধু তাদের নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু আধুনিক নাটকের চরিত্ররা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েই চলেছে। তাছাড়া লোকনাটকে চরিত্র সংখ্যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অল্প। যে কটি চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যেও বেশী বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু আধুনিক নাটকের চরিত্রসংখ্যা যে শুধু প্রচুর তা-ই নয়, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও বড্ড বেশী। চরিত্রসৃষ্টির প্রসঙ্গেই তাদের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে। লোকনাটকে দ্বন্দ্ব সর্বদা থাকে না। যখনও বা থাকে বহির্দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পায়। দন্দ্বমান চরিত্রদের হুহুংকার, আন্দোলন ও অস্ত্রের ঝংকার সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করে মাত্র। অথচ আধুনিক নাটকে এই বাহ্যসংঘাতের আড়ালে চিত্তের এক গূঢ় গভীর সংকটেরও দ্যোতনা থাকে। তাকে বলা হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রবিৎ অ্যালারডাইস নিকল যথার্থই বলেছিলেন যে, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। কিন্তু তা লোকনাটকের নয়, আধুনিক নাটকের।

সংলাপ রচনাতেও লোকনাটক এবং আধুনিক নাটকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। লোকনাটকের সংলাপ হতে পারে সম্পূর্ণ সংগীতে রচিত অন্ততঃ সুরেলা। কখনও বা আবৃত্তিধর্মী। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, বাগ্‌বিধি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লোকনাটকের চিহ্নায়ন সম্পূর্ণ করে। এক ধরনের বাস্তবতা ও সজীবতাও দেয় তা। বক্তব্য খুব সহজ ও সবল এবং স্থূল হাস্যরসময় হয়ে থাকে। আবেগ ও উল্লাস লোকনাটকের সংলাপে এমন ভূমিকা গ্রহণ করে যে অতিনাটকীয় (melodramatic) না হয়ে আর উপায় থাকে না তার। কিন্তু আধুনিক নাটকে সংলাপ নানা ধরনের হতে পারে। কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, বাস্তববাদী নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রূপক, সাংকেতিক নাটক — এগুলি সবই আধুনিক নাটক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সংলাপের ধরণ আলাদা। সংলাপ কবিতা বা গান বা গদ্যে যাই রচিত হোক না কেন, আধুনিক নাটকে নাটকের সূক্ষ্ম ক্রমপরম্পরাগুলি রক্ষা করা হয়। নাটকীয়তা থাকে বাস্তবভিত্তিক, অতিরেকযুক্ত নয়। ভাষা এখানে কখনও হয়

অতি সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনাধর্মী, কখনও বা বাস্তববাদী রুক্ষ, অমার্জিত এমনকি দুর্বোধ্যও। মানুষের মননশক্তি, মেধা এবং কল্পনাশক্তিকে আধুনিক নাটকের সংলাপই প্রতিফলিত করতে পারে। লোকনাটকের সংলাপে শুধু যে মৌখিক ভাষাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, অনেক সময় তাৎক্ষণিক বাচনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে আধুনিক নাটকের সংলাপের মত গুছিয়ে কথা বলা হয় না এখানে। সজ্জিত শব্দশ্রেণীর সৌন্দর্য, গূঢ় উক্তি, বক্রভাষণ ইত্যাদি আধুনিক নাটকের ভাষার বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে লোকনাটকের সংলাপ যে অত্যন্ত সাদামাটা নিতান্ত লৌকিক ভাষায় কিছু কথোপকথন মাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু লোকনাটকে সংলাপের নির্দিষ্টতাও নেই। একই নাটকের সংলাপ নানান দিনে অভিনেতা বা অধিকারীর তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যাগুণে তা অনেকটাই পাল্টে যেতে পারে। এমনকি সংলাপের মধ্যে যে কাহিনীর বিস্তার থাকে, সেই কাহিনীর কালানুক্রমও লঙ্ঘিত হয়ে যায়। যেমন কুশান পালার উল্লেখ করা যায়। সেখানে লক্ষ করি, অধিকারী, দোহার এঁরা রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে সমকালের ঘটনার উল্লেখ করছেন। স্থানীয় তথ্যসঙ্গ ব্যবহার করছেন কালগত ঐক্য বা স্থানগত ঐক্য বজায় রাখার কোনো দায় নেই তাদের। অথচ আধুনিক নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে Unity of time এবং Unity of Place রক্ষা করা।

মঞ্চসজ্জা বা মঞ্চ ব্যবস্থার দিক থেকে লোকনাটক এবং একালের নাটক যেন দুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। লোকনাটক চতুর্দিকে দর্শক পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত আসরে অভিনীত হতো। এমনকি অভিনয়ের স্থানটিও প্রথমে ছিল সমতল ভূমি। পরবর্তীকালে তাকে একটি উচ্চ বেদি ভূমিতে পরিণত করা হয়। দর্শকমণ্ডলী নাটকের সঞ্চলকদের চারদিকে অবস্থান করেন। দর্শকদের মধ্যেই মিশে থাকত অভিনেতা থেকে শুরু করে, বাদ্যযন্ত্রী, নাচনেওয়ালী থেকে সবাই। কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদিকে বাদ দিলে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সাজপোশাকও থাকত অতি সামান্যই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শকদের সঙ্গে performer-দের পোশাকের ও চেহারার কোনো পার্থক্য থাকত না। তবে অনেক সময় লোকনাটকের কুশীলবেরা মুখোশ ব্যবহার করতেন। লোকনাটক অভিনীত হত খোলা আকাশের নীচে। এমনকি দিনের বেলায়। ভ্রাম্যমান লোকনাটকের দলও ছিল। যখন রাতে অভিনীত হত, তখন হয়ত সামিয়ানা ব্যবহৃত হত। যে আলো থাকত তা ছিল সাধারণ মশাল বা হ্যাজাকের আলো। সে শুধু কুশীলবদের মুখ ও শরীর দেখবার জন্য। লোকনাটকে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত তার মধ্যে, দোতরা, বেনা, ঢোল, খোল, বাঁশী, করতাল, শিঙ্গা, সারিঙ্গা, মাটির হাঁড়ি — এগুলিই মুখ্য। আর কুশীলবদের পায়ে বাঁধা থাকত ঘুঙুর, গলায় উত্তরীয় বা গামছা, হাতের কব্জীতে বড়মাপের রুমাল। এরা সবাই সংলাপ বলতেন জোরে যাতে দূরে উপবিষ্ট দর্শকও তা শুনতে পান। প্রায় সব চরিত্রই সংলাপ আবৃত্তি করে বলতেন, বা গান গাইতেন। আর ছিল নৃত্য। সে নৃত্যে সূক্ষ্মতা তেমন ছিল না, কিন্তু একটা ছন্দ ছিল। আর নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকত। লোকনাট্যের অভিনয়রীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গই হচ্ছে এই নৃত্যবহুলতা।

গ্রীস, চীন, জাপান এবং আমাদের বৈদিক যুগ থেকেই লোকনাটকের মধ্যে এই নাচের প্রভূত প্রয়োগ লক্ষ করেছেন সমালোচক।[৪৪] নাচের মতই ব্যাপকভাবে মুখোশের ব্যবহার লোকনাটকের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। চরিত্র অনুযায়ী এইসব মুখোশের ব্যবহার করা হত। যেমন, রাবণ, হনুমান, রাক্ষস, ইন্দ্র, রাজা, রাজপুত্র, রানী প্রভৃতি। জন্তু জানোয়ারের মুখোশও প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হয়েছে। মুখাভিব্যক্তি পরিস্ফুটনের ব্যাপারটি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তাই মুখোশের সহায়তা গ্রহণ করতেন লোকনাটকের প্রযোজকরা। তাছাড়া খোলা জায়গায় যেখানে — আলোক প্রক্ষেপণের ব্যাপার নেই সেখানে বহুদূর উপবিষ্ট দর্শক সাধারণের জন্য এই মুখোশ অভিব্যক্তি প্রকাশে ও চরিত্রের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অভিনয় থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক জায়গায়, যথা বালির নৃত্যনাট্যে, ভারতের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্য নাটকে, যথা নাগানৃত্যে, ছৌনৃত্যে, গম্ভীরা ও গাজন উৎসবের নানা নৃত্যে এই মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়।"[৪৫] আবার এমন লোকনাটকও প্রচুর আছে যেগুলিতে অভিনয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। শুধু সংলাপ বলা ও গান করলেই সেক্ষেত্রে লোকনাটক তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আধুনিক নাটক পরিপূর্ণভাবে মঞ্চনির্ভর। 'শৈলগুহা প্রেক্ষাগৃহ' থেকে আজ পর্যন্ত মঞ্চব্যবস্থা অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে আধুনিক নাটকেরই প্রয়োজনে। মঞ্চব্যবস্থায় আর দর্শকদের পক্ষে সম্ভব নয় যে কোনো দিক থেকে নাটক দেখা। শুধুমাত্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্মুখ ভাগ থেকেই নাটক উপভোগ করা সম্ভব। এখন অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে দর্শক বিচ্ছিন্ন। এখন অভিনয়কর্ম সংঘটিত হবে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে। দিনের বেলাতেও তাই প্রয়োজন আলোর। শুধু মুখ ও শরীর দেখার জন্য নয়, চরিত্রগুলির ভাবাভিব্যক্তি দেখার জন্য বটে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল আলোকসম্পাতের। নানা রঙের আলো, নানা গভীরতার আলো, নানা তির্যকতার আলো শুধু আলো নয় ধ্বনি ব্যবহারও আধুনিক নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। আগে ধ্বনি বলতে ছিল শুধু কণ্ঠস্বর বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। এখন প্রকৃতির নানা ধ্বনি শুধু নয়, অনুভব ও বোধের প্রকাশক হিসেবেও নানা ধ্বনিসংকেত নাটকে অবশ্য প্রযোজ্য হয়ে উঠল। আধুনিক নাটকে পোশাকের বিচিত্র ব্যবহার। চরিত্র অনুযায়ী রাজার পোশাক, প্রজার পোশাক, যুদ্ধের পোশাক, বিয়ের পোশাক, সকালের পোশাক, দুপুরের পোশাক, রাত্রির পোশাক, উনিশ শতকের পোশাক, বিশ শতকের পোশাক, পৌরাণিক যুগের পোশাক, আফ্রিকার পোশাক, ভারতবর্ষের পোশাক — সবই আলাদা, ভিন্নরকমের যথাযথ নিখুঁত হওয়া চাই। শুধু মুখোশ দিয়ে আর চলছে না। ক্রমে মুখোশ উঠে যাবার ফলে আধুনিক নাটকে কুশীলবদের অভিনয় প্রক্রিয়াও পাল্টাতে হল। চোখ, গ্রীবা, ঠোঁট, মুখের পেশি এগুলিকে কসরৎ করে চরিত্র ও ভাবানুযায়ী ফুটিয়ে তুলতে হল। অভিনয়রীতি হল অনেক বাস্তববাদী, জীবন্ত ও মনোগ্রাহী। বাদ্যযন্ত্রের সীমাবদ্ধতাও আধুনিক নাটকে ঘুচে গেল। দেশি, বিদেশি সবধরনের বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও সবরকম ধ্বনি ব্যবহার করা হতে লাগল যার

উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। তবে অকারণে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কমে গেল। খুবই সূক্ষ্ম ভাবে কেবল তাৎপর্য কেন্দ্রিক ভাবে বাদ্যযন্ত্রের বা ধ্বনির প্রয়োগ হতে লাগল। ফলে নাটকের কাহিনীতে ও গতি প্রবাহে একটা অভূতপূর্ব ভারসাম্য ও রুচিবোধের প্রতিষ্ঠা হল।

বাদ্যযন্ত্রের মতই নৃত্যবহুলতাও কমে গেল আধুনিক নাটকে। আবার নৃত্যনাট্য নামক যে আধুনিক ধারার সূচনা হল সেখানে ভাবের সূক্ষ্মতা ও ব্যঞ্জনা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে লোকনাটকের সঙ্গে তার ভাবগত ও রসগত যোজন দূরত্ব অনুধাবন করতে আমাদের আর কোনো অসুবিধাই রইল না। সাধারণ নাটকে নৃত্যের পরিমিত প্রয়োগ হতে লাগল। পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী নৃত্যকে বিন্যস্ত করলেন নাট্যকারেরা। বলতে কি, মুখোশও বিদায় নিল আধুনিক নাটকে। চরিত্রের অভিব্যক্তি এখন এতই স্পষ্ট আলোকপ্রয়োগ এখন এতই বহুমাত্রিক যে মুখোশের আর দরকার রইল না।

আসলে লোকনাটকে নেপথ্যের কোনো ভূমিকাই ছিল না বলা চলে। যা কিছু হত সরাসরি, প্রত্যক্ষ, তাই সেখানে রহস্য ছিল না। কিন্তু আধুনিক নাটকে নেপথ্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। আলো, ধ্বনি, প্রম্পটার শুধু নয়, নাট্য প্রযোজনার পিছনে নাট্যকার থেকে শুরু করে কত শিল্পী, কত কারিগর ও কত মানুষের যে অদৃশ্য হাত ও শ্রম এখানে কাজ করে তার ইয়ত্তা নেই। এ এক বিরাট সমবায় শিল্প। লোকনাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের সবচেয়ে বড় পার্থক্য বোধ হয় এখানেই।

তথ্যসূত্র

১। বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃ: ৫২৭।

২। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৩। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৪। তদেব, পৃ: ৫২৮।

৫। তদেব, পৃ: ৫৪৯।

৬। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ: ২২২।

৭। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৯।

৮। তদেব, পৃ: ১৪০।

৯। তদেব, পৃ: ১৪০।

১০। লোকশ্রুতি, সেপ্টেম্বর, মেছেনী : লোকনাট্যের সম্ভাবনা, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৯৭।

১১। তদেব, পৃ: ৯৮।

১২। 'লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলা লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার' প্রবন্ধে লেখক মানস মজুমদার, নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রবন্ধ 'বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান : লোকনাট্যের একটি দিক' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।
দ্রষ্টব্য : বিষয় প্রবন্ধ, সম্পাদক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৪৭।

১৩। তদেব, পৃ: ১৪৭/১৪৮।

১৪। লোকশ্রুতি, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৯৭।

১৫। The Sanskrit Drama, Oxford University Press, A.B. Keith, p. 16.

১৬। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ৬।

১৭। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১০।

১৮। তদেব, পৃ: ২১০।

১৯। তদেব, পৃ: ২১১।

২০। তদেব, পৃ: ২১২।

২১। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৪২।

২২। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

২৩। তদেব, পৃ: ২।

২৪। তদেব, পৃ: ৭।

২৫। বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১২৯।

২৬। তদেব, পৃ: ১২৯।

২৭। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক : সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৩।

২৮। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ: ২২২-২২৩।

২৯। বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৪-৫।

৩০। তদেব, পৃ: ৬৩।

৩১। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ৩১।

৩২। কোচবিহারের লোকনাটক, দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ: ৯।

৩৩। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১৬।

৩৪। তদেব, পৃ: ২১৭।

৩৫। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৫।

৩৬। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৩৭। বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

৩৮। লোকঐতিহ্যের দর্পণে, মানস মজুমদার, পৃ: ১৩৮।

৩৯। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২০৯।

৪০। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৪১। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১।

৪২। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিষয় প্রবন্ধ, পৃ: ১৩৭।

৪৩। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ২০।

৪৪। নাটকের কথা, অজিতকুমার ঘোষ, পৃ: ২১৫।

৪৫। ঐদেব, পৃ: ২১২।